সমাজ বিপ্লবের ধারা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রকাশক: **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
হা. ফা. বা. প্রকাশনা-২৩

طريقة الثورة الاجتماعية
[الخطاب القيم لسعادة رئيس المؤسس عند المجلس العالى المركزى
لبنغلاديش أهل حديث جوبوشنغهو (جمعية شبان أهل الحديث
بنغلاديش) فى ٢٢/اكتوبر ١٩٨٦م]
سعادة صاحب الخطاب: د. محمد اسد الله الغالب

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৬, 'যুবসংঘ প্রকাশনী'।
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৪, 'যুবসংঘ প্রকাশনী'।
তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০০৯ হা. ফা. বা. প্রকাশনা।
ছফর ১৪৩০ হিঃ
মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৫ বাং

॥ লেখক কর্তৃক সম্পাদিত -সচিব, হা.ফা.বা ॥

কম্পিউটার কম্পোজ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স।

মুদ্রণ: বরেন্দ্র প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-০৩৩৩৩৪।

নির্ধারিত মূল্য : ১২ (বার) টাকা মাত্র।

SHAMAJ BIPLOBER DHARA by Dr. Muhammad Asadullah Al-ghalib, Professor of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Ph & Fax: 88-0721-861365. Ph : 760525. Price: Tk. 12.00 only.

সূচীপত্র

(المحتويات)

প্রকাশকের নিবেদন

(كلمة الناشر حول الطبعة الأولى سنة ١٩٨٦م)

بسم الله الرحمن الرحيم

বিগত ২২শে অক্টোবর '৮৬ বুধবার রাজশাহীর রাণীবাজার জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন '৮৬ উদ্বোধন করতে গিয়ে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যে অমূল্য ভাষণ প্রদান করেন, অত্র পুস্তিকাটি তারই অনুলিপি। ভাষণটির শেষে কর্মী ও সুধীবৃন্দের মৌলিক তিনটি প্রশ্নের জওয়াব 'তিনটি মতবাদ' নামে পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হ'ল। বর্তমান পরিবেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য ভাষণটি পথনির্দেশ হিসাবে কাজ করবে- এ বিশ্বাস নিয়েই ভাষণটি দুই অংশে দু'টি পুস্তিকাকারে পৃথকভাবে প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। বলা বাহুল্য ভাষণটি উপস্থিত সুধীমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয় এবং তা যথাসত্ত্বর ছেপে বিলি করার জন্য দাবী জানানো হয়। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের সত্যিকারের মুজাহিদ হিসাবে কবুল করে নিন। আমীন!

মুহাম্মাদ এনামুল হক
তাবলীগ সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد..

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ-

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'৮৬-তে দেশের বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত নিবেদিতপ্রাণ সাথী ও বন্ধুগণ, রাজশাহী শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় সুধীবর্গ, প্রশিক্ষক হিসাবে আগত মাননীয় ওলামায়ে কেরাম, বিদ্বান মণ্ডলী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের মাননীয় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি মহোদয়গণ!

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন '৮৬ উদ্বোধন করতে গিয়ে আমি প্রথমে স্মরণ করছি উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিগত সূর্যগুলিকে। স্মরণ করছি অলিউল্লাহ-পরিবার[১]-কে। স্মরণ করছি শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হোসায়েন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২),[২] নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০)[৩] ও তৎপরবর্তীকাল হ'তে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইল্‌মে কুরআন ও ইল্‌মে হাদীছের অতন্দ্র প্রহরীগণকে। সেই অতুলনীয় শিক্ষকবৃন্দকে;

---

১. *অলিউল্লাহ-পরিবার বলতে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী ও তাঁর চার পুত্র ও পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদসহ মোট বারো জনকে বুঝানো হয়। শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ), তৎপুত্র শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪), শাহ রফীউদ্দীন (১১৬২-১২৩৩/১৭৫০-১৮১৮), শাহ আবদুল ক্বাদের (১১৬৭-১২৫৩/১৭৫৫-১৮৩৮), শাহ আবদুল গণী (১১৭০-১২২৭/১৭৫৮-১৮২৪) এবং তাঁর পুত্র শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১)। জিহাদ আন্দোলনের এই মহান সিপাহসালার ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার পূর্বাহ্ণে বর্তমান পশ্চিম পাঞ্জাবের বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন।*

২. *দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার এই স্বনামধন্য মুহাদ্দিছের দীর্ঘ ৭৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ১ লক্ষ ২৫ হাযার ছাত্রের মধ্যে ৮০ হাযারই আহলেহাদীছ হয়ে যান। উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে এই মহান শিক্ষকের অবদান ছিল সর্বাধিক।*

৩. *তৎকালীন ভারতের ভূপাল রাজ্যের নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান রাজ্য পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব পালন করেও আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় অন্যূন ২২২ খানা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। মিসর থেকে হাদীছ গ্রন্থসমূহ ছাপিয়ে এনে সারা ভারতে বিতরণ করেন। এইভাবে লুপ্তপ্রায় ইলমে হাদীছ ও হাদীছ ভিত্তিক ইসলামকে তিনি পুনরায় লেখনীর মাধ্যমে জাগিয়ে তোলেন।*

স্মরণ করছি বালাকোটের অমর শহীদানকে; স্মরণ করছি কালাপানির বীর কয়েদীগণকে।

স্মরণ করছি আফগানিস্তান হ'তে শুরু করে বাংলার বিস্তীর্ণ বরেন্দ্র এলাকার শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সেই জানা-অজানা বীর মুজাহেদীনকে, যাঁদের ত্যাগপুত ইতিহাস আমাদের যাত্রাপথে প্রতিনিয়ত প্রেরণা যোগায়; উৎসাহ যোগায় সম্মুখে এগিয়ে যাবার। যাঁদের রক্তঋণ কিছুটা আদায়ের উদ্দেশ্যেই আমরা বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক তরুণ ভাই আজ এখানে জমায়েত হয়েছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের মহান পূর্বসূরীগণের, আমাদের মহান সালাফে ছালেহীনের যথার্থ উত্তরসূরী হওয়ার তওফীক দান করুন- আমীন!

পরিস্থিতির মূল্যায়ন
(تقدير البيئة الحاضرة)

বন্ধুগণ!

বর্তমান কম্পিউটার যুগে বিশ্বের পরিধি একেবারেই ছোট হয়ে গেছে। পৃথিবী নামক সৌরমণ্ডলের এই ছোট্ট গ্রহটিকে যদি একটি ছোট্ট পুকুরের সঙ্গে তুলনা করি, তাহ'লে এর এক প্রান্তে একটা ঢিল পড়লেও অপর প্রান্তে গিয়ে তার ঢেউ লাগে। তাই নিজের দেশের পরিস্থিতিকে আর বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আশান্বিত বিশ্বকে হতাশ ও বিমূঢ় করে জাগতিক শক্তিতে বলিয়ান বর্তমান বিশ্বের দুই পরাশক্তি আয়োজিত রিগ্যান-গর্বাচেভ-এর 'রিকজাভিক বৈঠক' দুঃখজনক ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।[৪] আর এর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে পাশ্চাত্যের মানবিক দেউলিয়াত্ব। অগণিত মারণাস্ত্রের গুদাম ছাড়া, বস্তুগত পাশবশক্তি ছাড়া মানবতার সামনে পেশ করার মত তাদের নিকটে কোন মূল্যবোধ আর অবশিষ্ট নেই। ফলে এক্ষণে শুরু হয়েছে দুই পরাশক্তির দেশী-বিদেশী ও

৪. *আইসল্যাণ্ডের রিকজাভিক (REYKJAVIK) নগরীতে ১৯৮৬ সালের ১১, ১২ ও ১৩ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ও সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ-এর মধ্যে দূর ও মাঝারি পাল্লার অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তির উদ্দেশ্যে তিনদিনব্যাপী এই গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অবশেষে এই বৈঠক ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্য উভয় প্রেসিডেন্ট একে অপরকে দোষারোপ করে বক্তব্য রাখেন (বাংলাদেশ অবজারভার ১৪ই অক্টোবর ১৯৮৬)।*

আমাদের স্বদেশী এজেন্টদের পারস্পরিক দোষারোপের পালা। শুরু হয়েছে ছাফাইয়ের মহড়া। এদের প্রচারযন্ত্রগুলো প্রাণান্ত কোশেশ অব্যাহত রেখেছে নিজেদের ভিতরকার দৈন্যদশা ঢাকবার জন্য। ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখা-নাঙ্গা মানুষ যারা নিরাপদ অবস্থানে থেকে দূর থেকে এই মহড়া অবলোকন করছে, তাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে গেছে এই সব তন্ত্রমন্ত্রের হোতাদের নগ্ন চেহারা। সারা বিশ্ব এখন উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে ইসলামের দিকে। আল্লাহ্‌র ঐশী হেদায়াতের দিকে।

বন্ধুগণ!

আমাদের দেশসহ সমগ্র বিশ্ব আজ সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। এ জাহেলিয়াত সার্বভৌম ক্ষমতার চাবিকাঠি মানুষের হাতে ন্যস্ত করেছে এবং কতিপয় মানুষকে মানুষের জন্য রব-এর মর্যাদা দিয়েছে। বস্তুবাদী শক্তিগুলি তাদের স্ব স্ব দার্শনিক পণ্ডিত ও রাজনৈতিক প্রভুদেরকে উক্ত আসনে বসিয়েছে। ধর্মীয় শক্তিগুলিও স্ব স্ব ধর্ম নেতাদেরকে নামে- বেনামে উক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

ঠিক এমনই পরিস্থিতি ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের প্রাক্কালে। বলতে গেলে প্রায় সারা বিশ্ব তখন রোমক ও ঈরানী (পারসিক) দুই পরাশক্তির করতলগত ছিল। মানুষ এদেরকেই আল্লাহ্‌র ছায়া[৫] ভেবে নিয়েছিল। এই সুযোগে এরা ছিনতাই করে নিয়েছিল সার্বভৌম ক্ষমতার চাবিকাঠি। জনগণকে তারা তাদের স্বার্থের বলি হিসাবে ব্যবহার করত- যেমন আজও সর্বত্র করা হচ্ছে।

তৎকালীন ধর্মীয় নেতাদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। তাঁরা যা বলতেন, জনগণ সেটাকেই 'দ্বীন' ভেবে নিত। জগদ্বিখ্যাত দানবীর হাতেম ত্বাঈ-এর পুত্র 'আদী ইবনে হাতেম তৎকালীন সময়ে খৃষ্টানদের নেতা ও যবরদস্ত আলেম ছিলেন। স্বীয় ভগ্নি ও সম্প্রদায়ের লোকদের উৎসাহে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় এলেন, তখন তাঁর গলায় স্বর্ণ খচিত[৬] ক্রুশ (+) চিহ্ন ঝুলন্ত

৫. *যেমন জুম'আর খুৎবায় বলা হয়ে থাকে,* السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. *'সুলতান বা শাসক পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ছায়া স্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁকে সম্মান করল, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি তাঁকে অসম্মানিত করল, আল্লাহ তাকে অসম্মানিত করবেন'। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীছটির প্রথমাংশ মুনকার, যঈফ ও মওযূ এবং দ্বিতীয় অংশটি 'হাসান'। -আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৬১-৬৪।*

৬. *কোন কোন বর্ণনায় এসেছে রৌপ্য খচিত (ইবনু কাছীর)।*

ছিল। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনে হাকীম-এর নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করছিলেন,

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَّاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ-

‘ইহুদী-নাছারাগণ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের আলেম ও দরবেশগণকে ও ঈসা ইবনে মারিয়ামকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদেরকে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এদের এইসব শিরক হ’তে সম্পূর্ণ পবিত্র’ *(তাওবাহ ৯/৩১)*।

উক্ত আয়াত শোনার সাথে সাথে ‘আদী বিন হাতেম বলে উঠলেন, إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ ‘আমরা তাদের ইবাদত করি না’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ ؟ قَالَ بَلَى.

‘আল্লাহ যা হালাল বা হারাম করেছেন, তারা কি তাকে হারাম বা হালাল করেনি? আর তোমরাও কি তাকে হারাম বা হালাল বলে গণ্য কর না? আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ ‘ব্যস ওটাই তো ওদের ইবাদত হ’ল’।[৭]

---

৭. *পুরা বর্ণনাটি নিম্নরূপ-*

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِىْ عُنُقِى صُلَيْبٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا عَدِىُّ إِطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ قَالَ: فَطَرَحْتُهُ وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِىْ سُوْرَةِ بَرَاءَةَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّهِ) قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ فَقَالَ: أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ - رواه ابن جرير فى تفسيره واللفظ لحديث ابى كُرَيْبٍ- وقال ابنُ عباس رضي الله عنه: أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَّسْجُدُوْا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوْهُمْ فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَالِكَ أَرْبَابًا- جامع البيان فى تفسير القران لابن جرير الطبري-

দ্রঃ তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরুত: ১৯৮৬) ১০/৮০-৮১ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৭১; আহমাদ, বায়হাক্বী।

ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, ইহুদী-নাছারাদের সমাজ ও ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহ পাক ঐসব আলেম, সমাজ নেতা ও দরবেশগণকে ‘রব’ হিসাবে অভিহিত করেছেন’।[৮]

দেড় হাযার বছর পূর্বেকার ন্যায় বর্তমানেও চলছে সারা বিশ্বে নামে-বেনামে আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা ছিনতাই করার মহড়া। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জনগণের নামে সার্বভৌম ক্ষমতা লুট করে তা কতিপয় ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করেছে। জনগণের শাসনের নামে তারা পার্টির শাসন চালায়। গণ আদালতের দোহাই পেড়ে তারা আল্লাহ্‌র আদালতে জওয়াবদিহিতাকে এড়াতে চায়। তারা তাদের ইচ্ছামত আইন তৈরী করে ওটাকেই জনগণের আইন বলে চালিয়ে দেয়।

অন্যদিকে ধর্মনেতারা নিজেদের তৈরী করা মাযহাব ও তরীকার নিকট শরী‘আতের চাবিকাঠি ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। জায়েয ও নাজায়েয, সুন্নাত ও বিদ‘আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে এদের নিজস্ব ফৎওয়ার উপরে। কখনও বা স্ব স্ব ফৎওয়ার পক্ষে জাল হাদীছ তৈরী করে শুনানো হচ্ছে। কখনওবা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কখনও বা নিজেদের স্বার্থে কোন হাদীছকে ‘মানসূখ’ (হুকুম রহিত) ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যে কোন মূল্যে নিজের কিংবা স্ব স্ব মাযহাব ও তরীকার গৃহীত ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রচলিত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও মাযহাবী তাক্বলীদ ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নামীয় বিভেদাত্মক জাহেলী মতবাদের চক্রান্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। পার্লামেন্টে ‘অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত’ এবং ‘জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস’- এলাহী সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ এই দুই শেরেকী মন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়েই এরা রাজনীতিতে নেমেছেন। এরা ‘আল্লাহ’ এবং ‘ইসলামের’ নামেই জনগণের নিকট ভোট চাইছেন। এদের ভোট না দেওয়াকে ইসলামের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া বলে গণ্য করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়- বহু দলে বিভক্ত এই রাজনীতিকরা প্রত্যেকেই ভাবেন, তার দলটিকে ভোট দিলেই কেবল এদেশে সত্যিকারের ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব, নইলে নয়।

---

৮. *তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরুত ছাপাঃ ১৯৮৬), ১০/৮০-৮১ পৃঃ।*

ট্রাজেডী এই যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের শেরেকী বিষবৃক্ষের ফল খেয়েই এঁরা রাজনীতি করছেন এবং সেখানে ইসলামকে ব্যবহার করছেন। প্রশ্ন করলে বলা হয় ‘বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কখনো কখনো শিরককেও বরদাশত করা চলে’ (নাঊযুবিল্লাহ)। আল্লাহ্‌র নিকট ঐসব যুক্তিবাদীরা কি কৈফিয়ত দিবেন সে প্রশ্ন না রেখেও একথা হলফ করে বলা চলে যে, ইসলামী সমাজ বিপ্লব কেবলমাত্র ইসলামী তরীকার মাধ্যমেই আসা সম্ভব, পাশ্চাত্য হ’তে আমদানী করা শেরেকী তরীকার মাধ্যমে নয়।

বন্ধুগণ! হতাশায় মুহ্যমান বিশ্ব যখন ইসলামের দিকে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে, তখন আমাদের উপরোক্ত অবস্থা কি দুঃখজনক নয়?

ইসলামের পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব

(كيف يمكن إحياء الإسلام)

এমত পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি যে, ইসলামের পুনরুজ্জীবন একমাত্র সেপথেই সম্ভব, যে পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগিয়েছিলেন। তিনি প্রথমেই রোগীর আক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে ঔষধ প্রয়োগ করেননি। বরং রোগের মূল কারণ অনুসন্ধান করে সেখানেই চিকিৎসা শুরু করেন। তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান দিয়ে অথবা চরিত্র সংশোধনের আন্দোলন থেকে কাজ শুরু করেননি কিংবা দেননি আরব জাতীয়তাবাদের মুখরোচক শ্লোগান। কারণ সত্যিকারের সামাজহিতৈষী হিসাবে তিনি চাননি যে, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ তৎকালীন রোমান বা ইরানী খপপর হ’তে মুক্তি লাভ করে পুনরায় আরবীয় প্রভুদের মরণ থাবার শিকারে পরিণত হৌক।

ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত

(الشرائط اللازمة للثورة الاجتماعية الإسلامية)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমস্যা সমূহের গোড়া ধরেই টান দিলেন এবং স্থায়ী সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে আক্বীদা পরিবর্তনের আন্দোলন শুরু করলেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুটিকয়েক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভু যেভাবে স্বাধীন মানুষকে নিজেদের গোলামে পরিণত করেছিল, সেই ছিনতাইকৃত সার্বভৌম ক্ষমতা নিরংকুশভাবে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট

সোপর্দ করার আহ্বান জানালেন। ঘোষণা করলেন- لا إله إلا الله ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’। ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’। আল্লাহ্‌র গোলামীর অধীনে সকল মানুষ স্বাধীন। সকল মানুষের অধিকার সমান। বলা বাহুল্য লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্‌র এই কালেমা সেদিন কেবল শ্লোগান মাত্র ছিল না। বরং এ ছিল সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের উদাত্ত ঘোষণা।

আরবরা আল্লাহ্‌কে জীবন-মৃত্যুর মালিক হিসাবে, সন্তানদাতা হিসাবে, রূযিদাতা হিসাবে মানতো। অনেকে আখেরাতে জওয়াবদিহিতায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঐ একই হেদায়াতের জ্যোতিধারা থেকে আলো নিতে হবে, এ কথা তারা মানতে রাযী ছিল না। তারা ভাবতো এসব ক্ষেত্রে আমরাই ইলাহ। তারা এসকল ক্ষেত্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করতে সম্মত হ’ল না। ফলে শুরু হ’ল ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সরাসরি দ্বন্দ্ব।

জাহেলিয়াতের শিখণ্ডীরা আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)- কে নেতৃত্বের টোপ দিল। অর্থ-সম্পদের লোভ দেখাল। আরও অন্যান্য লোভনীয় প্রস্তাব দিল। কিন্তু তিনি টললেন না। সমস্ত নিন্দা-অপবাদ ও বাধার ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় তিনি সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আক্বীদা সংশোধনের আন্দোলন চালাতে থাকলেন। ফলে দীর্ঘ তের বৎসরের মাক্কী জীবনে তৈরী হ’লেন এমন কিছু মর্দে মুজাহিদ তাযা সৈনিক, যারা সমাজ পরিবর্তনের কঠিন জিহাদে প্রত্যয়দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। যারা শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাময়িক কোন সমস্যা নিয়ে নয় বরং সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্যে ধীর অথচ দৃঢ় পদে এগিয়ে যেতে পারেন।

ফলাফল সবারই জানা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনে এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে খেলাফতে রাশেদার স্বর্ণ যুগে যে অনুপম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একথা বুঝা গেল যে, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ’ল দু’টি।-

১. প্রথমে আক্বীদায় বিপ্লব আনা ২. নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদায় বিশ্বাসী নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী কর্মীদের একটি জামা‘আত গঠন করা।

খেলাফতে রাশেদার আদর্শ পুনরায় কেন প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি?

(لم لم تقم الخلافة الراشدة مرة أخرى)

ছাহাবায়ে কেরামের পর বিভিন্ন কারণে ঐ ধরনের জামা'আত আর তৈরী হ'তে পারেনি। ফলে প্রকৃত ইসলামী সমাজ পুনরায় কায়েম হয়নি। তার প্রধান কারণ হিসাবে আমরা তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারি। **১. তাওহীদী আক্বীদা দুর্বলকারী বিভিন্ন অনৈসলামী দর্শনের অনুপ্রবেশ। ২. ঈমান ও আমলের মধ্যে ঐক্যতান শিথিল হওয়া ৩. জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষকামিতা।**

সমাজ বিপ্লবের ধারা

(الطرائق الثلاثة للثورة الاجتماعية الإسلامية)

উপরে চিহ্নিত তিনটি বিষয়ের আলোকে আমাদের যে কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে, তাও হবে তিনটি। **১. মূল তাওহীদকে উপলব্ধি করা।** এর মাধ্যমে প্রথমে সমাজের আক্বীদা সংশোধনে ব্রতী হওয়া এবং নির্ভেজাল ইসলামের দিকে ফিরে যাওয়া- যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ হ'তে উৎসারিত। **২. ঈমান ও আমলের বৈপরীত্য দূর করা।** এজন্য বাস্তব অনুভূতি নিয়ে কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়ন করা। **৩- জাহেলিয়াতের সঙ্গে সর্বতোভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা।** অতএব জাহেলিয়াতের অনুসারী ব্যক্তি যদি নিজের বাপ-ভাই-সন্তান বা আত্মীয়-স্বজনও হয়, তথাপি তাদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আল্লাহ্‌র কঠোর নির্দেশ পাঠ করুন সূরায়ে মুজাদালাহ্‌র শেষ আয়াতে।

বর্ণিত তিনদফা কর্মপন্থাকেই আমরা ইসলামী সমাজ বিপ্লবের তিনটি ধারা হিসাবে গণ্য করতে চাই।

ধারাগুলির ব্যাখ্যা

(تفصيل الطرائق)

আসুন! আমরা সমাজ বিপ্লবের উপরোক্ত তিনটি ধারার উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখি। প্রথম ধারাটি হ'ল তাওহীদের সঠিক উপলব্ধি।

তাওহীদে রুবূবিয়াত (পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্‌র একত্ব), তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত (আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর একত্ব) এবং তাওহীদে উলূহিয়াত (ইবাদতে একত্ব) এই তিন প্রকারের তাওহীদের মধ্যে জাহেলী যুগের আরবরা কমবেশী প্রথম দু'প্রকারের তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। তারা আল্লাহকে 'রব' হিসাবে, 'খালেক্ব' ও 'রাযযাক্ব' হিসাবে বিশ্বাস করত। অনেকে আখেরাতে হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী ছিল। তারা নিজেদের নাম 'আব্দুল্লাহ' 'আব্দুল মুত্ত্বালিব' প্রভৃতি রাখত। এতদসত্ত্বেও তারা 'মুসলিম' ছিল না এই কারণে যে, তাদের মধ্যে 'তাওহীদে উলূহিয়াত' ছিল না। তারা 'অসীলাপূজায়' বিশ্বাসী ছিল। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মৃত সাধু ব্যক্তির মূর্তি তৈরী করে তাদের নিকট নযর- নেয়ায পেশ করত। আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা শরীফের বাইরে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে আল্লাহ্‌র কোন হেদায়াত থাকতে পারে, একথা তারা মানতে প্রস্তুত ছিল না। এরা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক একজন নেতাকে 'ইলাহ'-এর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরই বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক শ্লোগান উচ্চারণ করেন- 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'। এখানে আল্লাহকে মানবার আগে 'গায়রুল্লাহ'কে বর্জনের কথা বলা হয়েছে। আর এ কারণেই পূণ্য অর্জনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল পাপ বর্জন করা। দুর্ভাগ্য এই যে, জাহেলী আরবরা আল্লাহ্‌কে মানতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু গায়রুল্লাহকে ছাড়তে প্রস্তুত ছিল না। পূণ্য অর্জনের আকাংখা ছিল, কিন্তু পাপ বর্জনে তারা রাযী ছিল না।

'তাওহীদ' সম্পর্কে বাংলাদেশের বর্তমান মুসলমানদের অধিকাংশের ধারণা জাহেলী আরবদের আক্বীদার সঙ্গে যে অনেকাংশে মিল আছে, তা আশা করি কারও বুঝতে বাকী নেই। আমরা 'বায়তুল মোকাররমে' গিয়ে আল্লাহ্‌কে মানি। 'সংসদ ভবনে' গিয়ে জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী সাজি। 'মাযারে' গিয়ে অসীলাপূজারী হই। আমাদের নামও আব্দুল্লাহ-আব্দুল মুত্ত্বালিব। আরবের মুশরিকরা যে নিয়তে নিজেদের হাতে গড়া মূর্তির কাছে যেত, আমরাও একই নিয়তে নিজেদের হাতে গড়া মাযার ও খানক্বাহে যাই। তারা তাদের বৈষয়িক বিষয়সমূহে আল্লাহ্‌র কোন আইন আছে বলে মানতো না। আমরা আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোন হেদায়াত আছে

বলে মানতে চাই না। আমরা কালেমার যিকর করে বা মাঝে মধ্যে জুম‘আ-জামা‘আতে হাযির হয়ে ভেবে নিই জান্নাত পাব। অথচ ইসলামের সকল হুকুম মানা সত্ত্বেও কেবলমাত্র যাকাত জমা দিতে অস্বীকার করায় আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কারণ ইসলামের অর্থনৈতিক বিষয়টিকে তারা অমান্য করেছিল। তাদের ছালাত-ছিয়াম কোন কাজে লাগেনি তাওহীদের মৌলিক বিশ্বাসে খুঁত থাকার কারণে।

আমাদের সমাজকে সর্বপ্রথমে তাই তাওহীদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মুসলিম জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই হেদায়াত নিতে হবে। আর সে হেদায়াত সঞ্চিত আছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মধ্যে- অন্য কোথাও নয়। আমাদেরকে সকল ব্যাপারে কেবলমাত্র ঐ দুই উৎস থেকেই আলো নিতে হবে।

প্রথম ধারাটি সম্পর্কে স্পষ্ট বুঝ হাছিল হয়ে গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারাটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা না দিলেও চলে। কারণ দুর্বল আক্বীদার লোক দ্বারা কখনও বিপ্লব হ’তে পারে না। আর বাতিলের সঙ্গে আপোষকামী ব্যক্তি কখনো হকপন্থী হ’তে পারে না।

মুক্তির একই পথ- দা‘ওয়াত ও জিহাদ

(طريق النجاة هو الدعوة والجهاد)

বন্ধুগণ!

সমাজ বিপ্লবের উপরোক্ত তিনটি ধারা প্রথমে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে নিজেকে আদর্শ নমুনা হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু একাজ একেবারে নির্বিঘ্নে সম্ভব হবে না। যখনই উক্ত তিনটি ধারার দিকে আপনি জনগণকে দাওয়াত দিবেন এবং তা কায়েম করতে প্রয়াসী হবেন, তখনই আপনার সমাজ এমনকি আপনার পরিবার আপনার উপর ক্ষেপে যাবে। বরং বলা যেতে পারে যে, জাহেলিয়াত তার সমগ্র হাতিয়ার নিয়ে আপনার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় আপনাকে তিনটি বস্তু সর্বদা মনে রাখতে হবে-

১. নিজেকে সব সময় জাহেলিয়াতের ময়দানে যুদ্ধরত সৈনিক মনে করা। ২. শাহাদাত পিয়াসী সৈনিকের বাঁচার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকা। ৩. নিজের কর্ম ও আচরণ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া। আল্লাহ্‌র ঘোষণা শুনুন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُواْ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ–

‘তোমরা কি ভেবে নিয়েছ যে জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ জানবেন না কে তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুজাহিদ, আর কে প্রকৃত ধৈর্যশীল?’ *(আলে ইমরান ৩/১৪২)*।

‘জিহাদ’ অর্থ আল্লাহ্‌র পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। ‘শহীদ’ অর্থ আল্লাহ্‌র পথে নিহত অথবা মৃত ব্যক্তি। জিহাদ মুমিনের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। যেখানেই সে অন্যায় দেখবে, সেখানেই সে প্রতিরোধ করবে। জিহাদকে বাদ দিয়ে মুমিন হিসাবে এ জগতে বেঁচে থাকা অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘জিহাদ ও সংকল্প (অর্থাৎ হিজরত ও জিহাদের খালেছ নিয়ত) চিরদিন বাকী থাকবে’।[৯] শয়তানের আয়ু অনেক দীর্ঘ। যতদিন শয়তান বেঁচে থাকবে, ততদিন তার বিরুদ্ধে জিহাদ বজায় থাকবে। জিহাদ থেকে যিনি পিছিয়ে আসবেন কিংবা অলসতা প্রদর্শন করবেন, তিনি শয়তানের সঙ্গে মিতালী করবেন এবং আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হবেন। আল্লাহ বলেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ– قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ، وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ–

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের বাপ-দাদা ও ভ্রাতা-ভগিনীদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের চাইতে কুফরকে অধিক ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তারা হ’ল সীমালংঘনকারী’।

৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫ ‘হজ্জ’ অধ্যায়; হা/৩৮১৮ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।*

‘(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদ যা তোমরা উপার্জন কর, ব্যবসা-বাণিজ্য যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা কর, ঘর-বাড়ী যা তোমরা অতিশয় প্রিয় মনে কর; এ সকল বস্তু যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ হ’তে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয়তর হয়, তবে আল্লাহ্‌র ফায়ছালা এসে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে কখনও পথ প্রদর্শন করেন না।’ *(তাওবাহ ৯/২৩-২৪)*।

জিহাদের প্রকৃতি

(كيفية الجهاد)

এদেশে ‘জিহাদ’ এবং ‘শহীদ’ শব্দ দু’টি স্থানে-অস্থানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রত্যেক দলই নিজেদের দলীয় স্বার্থে কাজ করাকে ‘জিহাদ’ ভাবেন এবং অপর দলের হাতে তাদের দলের কোন কর্মী মারা গেলে তাকে ‘শহীদ’ বলে আখ্যায়িত করেন। আসুন, আমরা এ বিষয়ে বর্তমান শতকের একজন মর্দে মুজাহিদ মিসরের সাইয়েদ কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬ খৃঃ)-এর কাছ থেকে জওয়াব নিই। তিনি ‘মুমিনের সংগ্রাম রাজনৈতিক নয় বরং আক্বীদা ও বিশ্বাসের সংগ্রাম’- এ প্রসঙ্গে বলেন,[১০]

‘ঈমানদারগণ ও তাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে যে সংগ্রাম অবিরতভাবে চলছে, এটা স্রেফ আক্বীদার সংগ্রাম, আদৌ অন্য কিছু নয়। তাদের শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয় স্রেফ ঈমানের কারণে। তারা তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয় স্রেফ আক্বীদার কারণে। এটি কোন রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়, অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয় বা কোন জাতি-গোষ্ঠীগত সংগ্রাম নয়। যদি এসবের সামান্য কিছুও হ’ত, তাহ’লে তা মিটানো সম্ভব হ’ত এবং তার সমাধান সহজ হ’ত।

---

১০. বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ
إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هى فى صحيحها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق وان خصومهم لاينقمون منهم الا الايمان ولايسخطون منهم الا العقيدة- انها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها وسهل حل إشكالها ولكنها فى صحيحها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام- معالم فى الطريق، ط-بيروت ١٩٨٣ ص ٢٠١-

কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এটি হ’ল আক্বীদা-বিশ্বাসের সংগ্রাম। হয় কুফর থাকবে, নয় ঈমান থাকবে। হয় জাহেলিয়াত থাকবে, নয় ইসলাম থাকবে’।[১১] যদিও ইসলামের শত্রুগণ সর্বদা এ লড়াইকে অন্যভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করে থাকে।

অতঃপর ‘শহীদ’ কে? সে বিষয়ে ওমর ফারূক (রাঃ) একদা খুৎবায় বলেন,

تقولون فِي مَغازِيْكم فلانٌ شهيدٌ ومات فلانٌ شهيدًا ... ألا لاتقولوا ذَلِكُمْ ولكن قولوا كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ مات فِي سبيل الله أو قُتِلَ فهو شهيدٌ، رواه أحمد بإسناد حسن-

‘তোমরা তোমাদের যুদ্ধ সমূহে বলে থাক, নিহত অমুক ব্যক্তি শহীদ বা মৃত অমুক ব্যক্তি শহীদ। ... তোমরা এরূপ বলো না। বরং ঐরূপ বল যেরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করল অথবা নিহত হ’ল, সে ব্যক্তি শহীদ’।[১২] কেননা কোন্ ব্যক্তি কোন্ নিয়তে জিহাদ করেছে, সে খবর একমাত্র আল্লাহ ভাল জানেন। খালেছ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হওয়াটাই এখানে বড় কথা। দুনিয়াবী কোন স্বার্থে নয়।

বন্ধুগণ!

নবীগণের ইতিহাস স্মরণ করুন। তারা কারো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থে ভাগ বসাতে যাননি। তাঁদের আমলের প্রতিষ্ঠিত শাসন শক্তিকে উৎখাতের চেষ্টা করেননি। তাহ’লে কেন তখনকার সমাজ সর্বশক্তি নিয়ে তাঁদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? কেন তাঁদেরকে জীবন্ত করাতে চিরে হত্যা করেছিল? কেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত নিক্ষেপ করেছিল? কেন আমাদের নবী (ছাঃ)-কে দেশ ছাড়তে হয়েছিল? কেন ‘আছহাবুল উখদূদ’কে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হ’ল?

জওয়াব আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই নিন-

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

---

১১. *সাইয়েদ কুতুব, মা‘আলিম ফিত ত্বরীক্ব (বৈরুত ছাপাঃ ১৯৮৩), পৃঃ ২০১*।
১২. *আহমাদ, হাদীছ হাসান; ফাৎহুল বারী ৬/১০৬ ‘জিহাদ’ অধ্যায় হা/২৮৯৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য*।

'তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল কেবলমাত্র একটিই কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিল, যিনি মহাপরাক্রান্ত ও চিরপ্রশংসিত' *(বুরূজ ৮৫/৮)*।

বলাবাহুল্য ঈমান ও কুফর, ইসলাম ও জাহেলিয়াত কখনো একত্রে বাস করতে পারে না। বর্তমানে মুসলিম সমাজে ব্যাপক অধঃপতনের মূল কারণ হ'ল জিহাদ বিমুখতা। আর জিহাদবিমুখতার প্রধান কারণ হ'ল আপোষকামিতা। তথাকথিত 'হেকমতের' দোহাই পেড়ে সর্বত্র জাহেলিয়াতের সংগে আমরা আপোষ করে চলেছি। কি আলেম কি সমাজনেতা সবাই যেন আমরা একই রোগে ভুগছি। আমরা আপোষ করেছি ধর্মীয় ক্ষেত্রে 'তাক্বলীদে শাখছী'র সঙ্গে, যা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নিরপেক্ষ অনুসরণের ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা। আমরা আপোষ করেছি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা, সামরিকতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে- যা এলাহী সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ বরখেলাফ। আমরা আপোষ করেছি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথে, যা ইসলামী অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা আপোষ করেছি সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের সঙ্গে, যা ইসলামী সংস্কৃতির সাথে অনেক ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ।

বন্ধুগণ!

আমাদেরকে অবশ্যই আপোষকামী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। যেমন করেছিলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর মাক্কী জীবনে। জাহেলী সমাজে বাস করেও তিনি জাহেলিয়াতের সঙ্গে আপোষ করেননি। সমাজ তাঁকে একঘরে করেছে। তাঁর জন্য বাজার নিষিদ্ধ করেছে। গাছের ছাল-পাতা খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করেছেন। তথাপি সমাজের সঙ্গে আপোষ করেননি। মর্মান্তিক অগ্নি পরীক্ষা সত্ত্বেও আপোষ করেননি পিতা ইবরাহীম (আঃ) তৎকালীন সমাজ ও সরকারের সাথে। শুধু পিতা ইবরাহীম কেন দুনিয়ার সকল নবীর ইতিহাস জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদের ইতিহাস। কোন নবীই স্বীয় জীবনে স্বীয় সমাজে মেজরিটির সমর্থন পাননি। এমনকি ক্বিয়ামতের দিন কোন কোন নবী মাত্র একজন উম্মত নিয়ে হাযির হবেন।[১৩]

১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৪।*

সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না পাওয়ার অর্থ কি তাঁরা বাতিলপন্থী ছিলেন? (নাঊযুবিল্লাহ)। তাঁরা ক্ষমতা ও পদমর্যাদার লড়াই করেননি। তাঁরা চেয়েছিলেন আল্লাহ্‌র পাঠানো অভ্রান্ত সত্যকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে। হক্ব-এর আওয়াযকে বুলন্দ করতে। বাতিলকে বাতিল হিসাবে চিহ্নিত করতে।

আমাদেরকেও নবীগণের পথ বেছে নিতে হবে। সে পথ ভোটারের মনস্তুষ্টির পথ নয়, সে পথ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ। সে পথ শুধু চেয়ার পরিবর্তনের পথ নয়, সে পথ সমাজ পরিবর্তনের পথ, সমাজ বিপ্লবের পথ, আপোষহীন জিহাদের পথ।

জিহাদের হাতিয়ার

(أسلحة الجهاد)

ইসলামী পরিভাষায় জিহাদের তাৎপর্য চিরকাল একই থাকবে। তবে জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। অসিযুদ্ধ এখুনি নয়। মসীযুদ্ধ অসির চাইতে মারাত্মক। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ/১২৬৩-১৩২৮ খৃঃ)-কে জেলখানায় আটকে রেখেও সরকার নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে তাঁর কাগজ-কলম কেড়ে নিয়েছিল। বাধ্য হয়ে জেলখানার বাবুর্চির সৌজন্যে কিছু কয়লা সংগ্রহ করে তাই দিয়ে নিজ কক্ষের দেওয়াল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কালি দিয়ে আলোকিত করেছিলেন।

বাতিল শক্তিগুলি যে সব হাতিয়ার নিয়ে হক-কে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টায় রত, আমাদেরকে ওহোদের ময়দানের ন্যায় বাতিলের হামলার সেসব অলি-গলিতে সতর্ক প্রহরায় থাকতে হবে। এ যুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হ'ল তিনটি: **কথা, কলম ও সংগঠন**। আপনাকে অবশ্যই কথা বলা শিখতে হবে। যদি 'টেবিল টক'-এ পটু হন, সেটা করুন। যদি স্টেজ-এর বক্তৃতায় পারঙ্গম হন, তবে তাই করুন। ইল্‌মের ডিপো হয়ে বসে থাকলে চলবে না। দাওয়াত দিন। মানুষের নিকট হক-এর আহ্বান পৌঁছে দিন। যে কোন সমস্যায় কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সমাধান নিন। দ্বীনের ব্যাপারে কপোল কল্পিত কোন কথা বলবেন না। কুটতর্কে জড়াবেন না।

লিখুন। আপনার লেখা মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানুক। সেখানে ঝংকার উঠুক। সমাজ বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠুক। ঘুণে ধরা আক্বীদায় পরিবর্তন আসুক। আপনার বই ছিঁড়ে ফেলুক, দুঃখ নেই। কিন্তু সাথে সাথে হৃদয়ে লালিত জাহেলিয়াতের অন্ধকার যেন ছিঁড়ে খান খান হয়ে যায়। বিদেশী ভাষা শিখুন। কিন্তু মায়ের ভাষায় লিখুন। কেননা আল্লাহ আপনাকে-আমাকে এদেশেই দ্বীন প্রচারের জন্য মনোনীত করেছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

বিচ্ছিন্ন জনগণ যখন একটি আদর্শমূলে একই লক্ষ্যে একই নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত হয়, তখন সেটি একটি জনশক্তিতে পরিণত হয়। আমাদেরকে অবশ্যই একটি সংঘবদ্ধ জনশক্তি হিসাবে, একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। এদেশের বাতিলপন্থীরা তাদের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ। হকপন্থীদের তাদের করুণার ভিখারী হয়ে বেঁচে থাকার কোন অবকাশ নেই।

আন্দোলন অথবা ধ্বংস

(الحركة او الهلاكة)

কথা, কলম ও সংগঠন- জিহাদের এই ত্রিমুখী হাতিয়ার নিয়ে আমাদেরকে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَنصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ–

‘হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম সুদৃঢ় করবেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। ‘আল্লাহ তার দ্বীনকে হেফাযত করবেন’ অতএব আপনার-আমার কিছুই করণীয় নেই- এই ধরনের ধোকা হ’তে দূরে থাকুন। আল্লাহ যেমন দ্বীনের মালিক, তেমনি আপনার রূযিরও মালিক। কিন্তু রূযি কামাইয়ের বেলায় তো আপনি ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন না। বিনা প্রচেষ্টায় যদি রুযি আপনার ঘরে না আসে, তাহ’লে বিনা প্রচেষ্টায় দ্বীন কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? তীব্র স্রোতের মুখে দুর্বল বাঁধের যেমন কোন অস্তিত্ব থাকে না, সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের তীব্র স্রোতের মুখে হকপন্থীদের প্রতিরোধ যদি মযবুত না হয়, তাহ’লে

তারাও তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন ঐ দায়িত্ব আল্লাহ অন্য লোকদের হাতে ন্যস্ত করবেন, আমরা মাহরূম হব। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ–

‘যদি তোমরা (জিহাদে) বেরিয়ে না পড়, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিবেন এবং অন্য কওমকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। যাদেরকে তোমরা কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সকল বস্তুর উপরে কর্তৃত্বশীল *(তওবা ৯/৩৯)*। অতএব হয় আন্দোলন, নয় ধ্বংস, যে কোন একটি পথ বেছে নেওয়ার দায়িত্ব আপনার-আমার।

জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়

(طريق الجنة ليس زهرىٌ)

মধু পেতে গেলে মৌমাছির কামড় সহ্য করতে হয়। গোলাপ আহরণ করতে গেলে আঙ্গুলে কাঁটা ফোটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। জান্নাত পেতে গেলে তেমনি কাঁটা বিছানো রাস্তায় চলতে হবে। বিলাসিতাকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে হবে। সকল প্রকারের রিয়া ও অহংকার পায়ের তলে দাবাতে হবে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সকল কষ্ট হাসি মুখে বরণ করে নিতে হবে। আল্লাহ বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ أَلآ إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ–

‘তোমরা কি ভেবে নিয়েছ যে, জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনও তোমাদের কাছে এসে পৌঁছেনি ঐ ধরনের দুঃখ-বেদনা, যা স্পর্শ করেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল বাইরের বিপদ ও ভিতরের কষ্টসমূহ এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। অবশেষে রাসূল ও তাঁর সঙ্গী

ঈমানদারগণ বলতে বাধ্য হয়েছিলেন- আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে! জেনে রেখ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য অতীব নিকটবর্তী' *(বাক্বারাহ ২/২১৪)*।

নবীগণ ও তাঁদের সাথীদের যদি এমন অবস্থা হয়, তাহ'লে জাহেলিয়াত যখন মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে দৃঢ়ভাবে জেঁকে বসে আছে, সে অবস্থায় আমাদের মত গোনাহগারদের আরও কত গুণ বেশী কষ্ট ও মুছীবতের সম্মুখীন হ'তে হবে?

তিনটি হুঁশিয়ারী

(التحذيرات الثلاثة)

পরিশেষে আমরা যারা 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' হিসাবে আজ এখানে সমবেত হয়েছি, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বিশেষ কয়েকটি কথা আরয করতে চাই-

আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছি। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে জীবনের সবকিছু কুরবানী দেওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ্‌র নামে ওয়াদা করেছি। আর সেজন্যই শয়তান অন্য সকলের চাইতে আমাদের পিছনে কাজ করবে বেশি। সে আমাদেরকে প্রধানতঃ তিনভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে।-

১. আমরা আন্দোলনের তড়িৎ ফল পেতে চাইব। ২. অন্যদের দুনিয়াবী জৌলুস দেখে প্রতারিত হব। ৩. আমরা পরস্পরের আমানতে সন্দেহ করব।

মনে রাখবেন শয়তান যদি এই তিনটি হাতিয়ারের কোন একটি আমাদের উপরে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়, তাহ'লে আমাদের ঐক্য বিনষ্ট হবে। আন্দোলন ব্যাহত হবে।

মুমিনের জন্য পার্থিব বিজয়লাভ অপরিহার্য নয়

(انتصار الدنيوى لا يلزم للمؤمن)

আর একটি কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, মুমিনের জন্য পার্থিব বিজয় লাভ যরূরী নয়। আমরা আমাদের আন্দোলনের বিনিময়ে দুনিয়ায় কিছু চাই না। সবকিছু আখেরাতে চাই। আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيْبٍ-

'যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু পরকালে তার কিছুই অংশ থাকবে না' *(শূরা ৪২/২০)*। যদি আমরা কখনো পার্থিব বিজয় লাভ করি তবে তাতে ধোকা খাওয়ার কিছুই থাকবে না। কেননা পার্থিব বিজয় লাভ মুমিনের আন্দোলনের প্রতিদান নয় বরং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ মাত্র। আমরা বলব ওটা আমাদের ঈমানের পরীক্ষাও হ'তে পারে। মনে রাখতে হবে যে, ক্ষমতা দেওয়ার মালিক আল্লাহ। যেমন তিনি বলেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

'আপনি বলুন হে আল্লাহ! তুমিই রাজ্যাধিপতি। যাকে খুশী তুমি রাজ্য দান করে থাক এবং যার কাছ থেকে খুশী তুমি রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে থাক। যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা তুমি অসম্মানিত করে থাক। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী' (*আলে ইমরান ৩/২৬*)।

অতএব আসুন! শুধু রাজনীতি নয়, শুধু অর্থনীতি নয়, বরং সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে আমরা নবীদের তরীকায় এগিয়ে চলি। আমাদের জান-মাল, সময়-শ্রম, শিক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি তথা আল্লাহ্‌র দেওয়া আমাদের

সকল প্রিয় বস্তুকে পিতা ইবরাহীমের ন্যায় আল্লাহ্র রাহে উৎসর্গ করি। আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ–

‘(হে নবী) আপনি বলুন! আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই কেবল বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ্র জন্য’ *(আন‘আম ৬/১৬৩)*।

আসুন! আমরা পুনরায় উচ্চারণ করি ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সেই দুনিয়া কাঁপানো শ্লোগান...‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’। জীবনের কোন ক্ষেত্রে ‘নেই কোন ইলাহ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত’। পরিশেষে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং সকল দরূদ তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার ও ছাহাবীগণের জন্য।

(প্রশ্নোত্তর অংশটুকু ‘তিনটি মতবাদ’ নামক আলাদা পুস্তকে দেখুন)

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

Rxe‡bi †P‡q `xß g,,Zz¨
ZLwb Rvwb

প্রকাশকের কথা

সূদ হ’ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পৃথিবীর আদিকাল থেকে সূদ ভিত্তিক ঋণদান ব্যবস্থা চলে আসছে। যার মন্দ প্রেরণা হচ্ছে ঋণ গ্রহিতাকে বাগে পেয়ে শোষণ করা। বিপদগ্রস্ত মানুষকে ঋণ দিয়ে উপকার করার মানবিক তাকীদ এর ফলে ধ্বংস হয়ে যায়।

সকল নবী ও রাসূল এবং মুসলিম-অমুসলিম সকল মণীষী যুগে যুগে সূদকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং সূদ থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে উপদেশ দিয়েছেন। মদীনায় ইসলামী খেলাফতের সময়েই মানুষ প্রথম সূদ বিহীন ইসলামী অর্থনীতির সুফল ভোগ করে এবং ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে আরবের কোথাও যাকাত নেওয়ার মত গরীব এবং হকদার খুঁজে পাওয়া যেত না। আজও সেটা সম্ভভ যদি জনগণ সচেতন হয় এবং সেভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো হয়।

বাংলাদেশের জনগণকে সূদের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এজন্য আমরা দেশের খ্যাতনামা ইসলামী অর্থনীতিবিদ এবং ইসলামী ব্যাংকের বিগত ২৫ বছর যাবত কেন্দ্রীয় শরী‘আহ কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের মূল্যবান দু’টি নিবন্ধ, যা ইতিপূর্বে মাসিক আত-তাহরীক (......) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা লেখক কর্তৃক পুনরায় সংশোধিত হয়ে বই আকারে বের করতে পেরে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি।

পবিত্র কুরআনের সাতটি আয়াত এবং চল্লিশটিরও বেশী হাদীছ দ্বারা সূদের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূদের টাকা যতই বৃদ্ধি পাকনা কেন, তার শেষ পরিণতি হ’ল দরিদ্রতা *(আহমাদ, সনদ ছহীহ)*। অথচ বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে সূদী অর্থনীতি চালু রয়েছে। সূদের টাকা শোধ করতে না পারলে একদিকে সরকার পিটাচ্ছে ও জেল খাটাচ্ছে। অন্যদিকে গ্রাম্য সূদী মহাজন ও এনজিও-র লোকেরা ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাচ্ছে। কেউবা ঋণ ভারে জর্জরিত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটিকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশ গাছে বেঁধে রেখে অন্যদের ভয় দেখাচ্ছে। এসব দুনিয়াবী যুলুমের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা এবং পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে ঈমানদারগণকে সাবধান করার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যদি এর দ্বারা সরকার ও জনগণ হুঁশিয়ার হন এবং সূদ থেকে বিরত হন এবং সর্বোপরি আল্লাহ আমাদের এ নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা কবুল করেন, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। মাননীয় লেখক লেখাটিকে ছাদকায়ে জারিয়াহ হিসাবে হাদীছ ফাউণ্ডেশনকে দান করেছেন। আল্লাহ তাঁকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

-পরিচালক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।